বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসি

এবং

রিসালায়ে নুর

মুহাম্মদ ইরফান হাওলাদার

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসি
এবং
রিসালায়ে নুর

মুহাম্মদ ইরফান হাওলাদার

প্রকাশনায়
গার্ডিয়ান পাবলিকেশন
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা– ১১০০
০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮
guardianpubs@gmail.com
www.guardianpubs.com

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com

প্রথম প্রকাশ : ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

শব্দ বিন্যাস : গার্ডিয়ান টিম
প্রচ্ছদ : হাসান শাহিন
মুদ্রণ : একতা অফসেট প্রেস
১১৯, ফকিরাপুল, জবেদা ম্যানশন, মতিঝিল, ঢাকা।

হার্ডকভার মূল্য : ৩৫০
পেপারব্যাক মূল্য : ৩২৫

ISBN: 978-984-8254-72-1

Badiuzzaman Said Nursi & Risala-i-Nur by Mohammad Irfan Howlader,
Published by Guardian Publications, Price TK. 350 (HC)/TK. 325 (PB) Only.

প্রকাশকের কথা

খিলাফতের পড়ন্ত বিকেলে আলোর প্রদীপ হয়ে আবির্ভাব ঘটল এক মনীষীর। নাম– সাঈদ নুরসি। চিন্তা-জ্ঞানে-মননে সে সময়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিভার অধিকারী হওয়ার উপাধি পান ‘বদিউজ্জামান’। বদিউজ্জামান অর্থ কালের বিস্ময়। সত্যিকার অর্থেই বদিউজ্জামান ছিলেন তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ মানুষদের একজন। খিলাফত বিলুপ্তির পর যখন একের পর এক ইসলাম পালনে নিষেধাজ্ঞা শুরু হলো, তখন জ্বলে উঠলেন বদিউজ্জামান। অত্যাচারী শাসকের সামনে উচ্চকণ্ঠে মহাসত্যের দাওয়াত তুলে ধরলেন।

বিনিময়ে...

বিনিময়ে শুরু হলো কারা নির্যাতন ও নির্বাসন। এই কারাগার থেকে সেই কারাগার। এখান থেকে সেখানে। কিন্তু ইতিহাসের বিপ্লবীরা কখনো থেমে ছিল কি? তারা যেখানে যে পরিস্থিতিতে ছিলেন, সেখানেই নীরালায় বিপ্লবের বীজ বুনন করেছিলেন। বদিউজ্জামানও তাঁর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁকে যেখানেই শৃঙ্খলিত করে রাখা হয়েছিল, সেখানেই ফুটিয়েছিলেন প্রশান্তির ফুল। কারাবাস ও নির্বাসনের ২৭ বছরে রচনা করেছিলেন বিখ্যাত অমর গ্রন্থ ‘রিসালায়ে নুর’। বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসি সত্যের যে চারাগাছ রোপণ করে গিয়েছিলেন, তা আজ ফুলে-ফলে সুশোভিত। লাখো পথহারা মানুষ সেই ফুলের ঘ্রাণে ব্যাকুল হয়ে ফিরে এসেছে আল-কুরআনের ছায়ায়।

রিসালায়ে নুরের ছাত্র ইরফান হাওলাদার বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য লিখেছেন ‘বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসি এবং রিসালায়ে নুর’ বইটি। ‘গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স’ বইটি প্রকাশ করতে পেরে উচ্ছ্বসিত। লেখকের প্রতি দুআ ও ভালোবাসা।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গার্ডিয়ান টিমের প্রতি, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমরা পাঠকদের হাতে নিত্য-নতুন বই তুলে দেওয়ার প্রয়াস পাচ্ছি। আল্লাহ তাদের উত্তম জাজাহ দান করুন।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরুদ ও সালাম প্রিয়নবি ও তাঁর পরিবারের ওপর। সত্যিই অবাক হচ্ছি– আজ থেকে পাঁচ বছর আগে বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসি ও রিসালায়ে নুর শিরোনামে একটি মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলাম। ঠিক পাঁচ বছর পরে একই শিরোনামে বই বের হবে তা কখনো কল্পনাও করিনি। এটা সত্যিই আল্লাহর ইচ্ছাতেই সম্ভব হয়েছে।

বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসি ছিলেন মুসলিম উম্মাহর ক্রান্তিলগ্নে আবির্ভূত হওয়া সে সকল মানুষদের একজন, যারা জাহিলিয়াতের ঘন অন্ধকারে মশাল হাতে আলোর মিছিল শুরু করেছিলেন। তাঁর হাতে সূচিত সেই আলোর মিছিলই আজ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি আমাদের দেখিয়েছেন, কীভাবে একটি ইসলামি সমাজে নেমে আসা অন্ধকারকে কুরআনের আলো দিয়ে বিদূরিত করতে হয়। দেশ ও জাতির বিপর্যয় ও ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতির একটি অবক্ষয়ের সময়েও ঈমানের নুর ছড়িয়ে দিয়ে সেই অন্ধকারকে দূর করতে হয়। আরও দেখিয়েছেন, ভালোবাসা দিয়ে কীভাবে মানুষকে আল্লাহর পথে আনতে হয়।

তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞ আলিম। দেশের জন্য লড়াকু সৈনিক, ইসলামের খাদেম। শরিয়াহতে অতন্দ্র প্রহরী। কুরআনের জন্য সারাজীবন কারাপ্রকোষ্ঠ কাটিয়ে দেওয়া এক উস্তাদ; যিনি অন্ধকারের কারাপ্রকোষ্ঠকেই বানিয়েছিলেন আলোর মাদরাসা।

উম্মাহর প্রেরণার এই বাতিঘরকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্য এই বইটি আপনাদের জন্য সহায়ক হবে সেই উদ্দেশ্যেই লেখা। বইটির কাজ শুরু করতে গিয়ে বারবার থেমে গিয়েছিলাম। তবে প্রকাশক নূর মোহাম্মাদ ভাইয়ের তাগিদের কারণে অবশেষে আল্লাহর রহমতে লেখাগুলো আজ মলাটবদ্ধ হলো। বইটি লিখতে গিয়ে প্রকাশকসহ আরও বেশ কয়েকজন আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তাদের সকলের জন্য দুআ ও ভালোবাসা। আল্লাহ বইটিকে কবুল করে নিক এবং আমাদেরও ইসলামের খাদেম হিসেবে কাজ করার তাওফিক দান করুক।

মুহাম্মদ ইরফান হাওলাদার
ইস্তানবুল, তুরস্ক

সূচিপত্র

প্রাথমিক জীবন	১১
নুরসির নব-আবির্ভাব	৭৪
বন্দিজীবনের সূচনা	৯৪
রিসালায়ে নুরের বিজয়	১৫২
শেষবেলা	১৬৯
রিসালায়ে নুর	১৯০

প্রাথমিক জীবন

জন্ম

দুর্গতি, দুর্দশা ও অন্ধকার সময়ে উম্মাহকে কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক পথ দেখিয়েছেন—এমন আলিমের সংখ্যা ইসলামের ইতিহাসে কম নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম উম্মাহর চরম দুর্দিনে, তুরস্কের কঠিন অবস্থার সন্ধিক্ষণে একজন অমিত মনোবল মহাপুরুষের জন্ম অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। সমগ্র মুসলিম উম্মার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক উসমানি খিলাফাতের ক্ষীয়মাণ দশায় ১৮৭৭ সালে (১২৯৩ হিজরি) ফজরের আজানের সময় পূর্ব তুরস্কের বিতলিস প্রদেশের নুরস নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সাঈদ নুরসি। পিতা সুফি মির্জা সাহেব ছিলেন একজন অত্যন্ত আল্লাহভীরু দ্বীনদার ব্যক্তি। তিনি এতটাই পরিচ্ছন্ন জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন যে, জীবনে কখনো কোনো অবৈধ জিনিস আস্বাদন করেননি এবং স্বীয় সন্তান-সন্ততিকে অবৈধ কিছু পানাহার করাননি। এমনকী চারণভূমি থেকে বাড়ির দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি গবাদি পশুর মুখ বেঁধে দিতেন, যেন অন্যদের শস্যখেতে কিছু না খেয়ে ফেলে। তার মহীয়সী মা নুরিয়া বলতেন–

> ‘আমি আমার সন্তানদের সব সময় পবিত্র ও অজু অবস্থাতেই দুধ পান করাতাম।’

মা সম্পর্কে বলতে গিয়ে নুরসি বলেন–

> ‘মানুষের জীবনে সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে প্রভাবশালী শিক্ষক হচ্ছে তার মা। আমি নিজ জীবনে সর্বদা এ মহাসত্যকে অনুধাবন করেছি। ৮০ বছরের জীবনে ৮০ হাজার ব্যক্তির নিকট থেকে শিক্ষাগ্রহণ করলেও শপথ করে বলতে পারি—মায়ের নিকট থেকে মৌলিক ও আধ্যাত্মিক যে শিক্ষা পেয়েছি, তা আমার স্বভাবপ্রকৃতির মূল ভিত্তি। আমার জীবনের অন্যান্য শিক্ষা ওই ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত।’[১]

প্রতিপালন

ছোটোবেলা থেকেই সাঈদ নুরসির মেধা ও প্রতিভার নিদর্শনসমূহ ফুটে উঠেছিল। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলেই তিনি বেশ কিছু প্রশ্ন করতেন, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করতেন। তিনি বিজ্ঞ আলিমদের সভায় যোগ দিয়ে আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। তুরস্কে তখন একদল বিজ্ঞ আলিম ছিলেন, যারা শীতের দীর্ঘ রাতে কোনো একজনের বাড়িতে একত্রিত হতেন। নুরসি এমন জমায়েতে নিয়মিত যেতেন। একবার তার মনের মধ্যে একটি খুব সুন্দর প্রশ্ন জাগল। তিনি বললেন–

---

১. রিসালায়ে নুর আল-লাম’আত

> ‘ছোটোবেলায় আমি একদিন কল্পনায় নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম– দুটি বিষয়ের মধ্যে আমার জন্য কোনটি উত্তম? পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী সাম্রাজ্য আর তার চাকচিক্যে মোহিত হয়ে ভোগ-বিলাসে হাজার বছর বেঁচে থাকার পর একসময় মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া? নাকি আপাত কষ্টকর জীবন অতিবাহিত করার পরে চিরস্থায়ী অস্তিত্ব লাভ করা? দেখলাম—আমার মন আপাত কষ্টকর জীবন অতিবাহিত করে চিরস্থায়ী জীবন লাভের প্রতি উৎসাহী এবং হাজার বছরের ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসের প্রতি রুষ্ট। দেখলাম, আমার মন বলছে– নিশ্চয়ই আমি মৃত্যু নামক ক্ষণস্থায়ীত্ব চাই না; চাই চিরস্থায়ী জীবন।’[২]

মূলত এই কথার দ্বারা নুরসি বোঝাতে চেয়েছেন– মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে চিরস্থায়ীভাবে কোথাও পাঠানোর জন্য। কারণ, মানুষের স্বভাব প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে অনন্ত ও সীমাহীন চাহিদা। মানুষ এটা বুঝতে শুরু করেছে যে, এই সংক্ষিপ্ত ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া তাদের সীমাহীন চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট নয়। অথচ বস্তুবাদী ও নাস্তিক্যবাদী দর্শন মৃত্যুপরবর্তী আখিরাত জীবনকে অস্বীকার করে দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনকেই চূড়ান্ত বলে বিশ্বাস করে এবং ‘দুনিয়াটা মস্ত বড়ো, খাও দাও ফুর্তি করো’– এই ভোগবাদী দর্শনকে নিজেদের পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করে।

কিন্তু মানুষ দুনিয়ার সকল ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত থেকেও তার অন্তরকে প্রশান্ত করতে পারছে না। এর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নুরসি তাঁর রিসালায়ে নুরে অন্যত্র বলেন–

> ‘মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিতে চিরস্থায়িত্বের প্রতি তীব্র এক আকর্ষণ ও প্রেম রয়েছে। এমনকী মানুষ তার প্রত্যেকটি প্রিয় জিনিসের মাঝে কল্পনাশক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে এক ধরনের স্থায়িত্ব রয়েছে বলে ধারণা করে। তারপর তাকে ভালোবাসে। যখনই সে ওই জিনিসের বিলুপ্তির কথা চিন্তা করে কিংবা বিলুপ্তি দেখতে পায়, তখন তা সহ্য করতে না পেরে বিলাপ করতে থাকে। বিচ্ছেদের কারণে মানুষের যত আর্তনাদ, তা মূলত চিরস্থায়িত্বের প্রতি আসক্তিরই অভিব্যক্তি। যদি চিরস্থায়িত্বের কল্পনা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির মাঝে না থাকত, তবে সে কোনো কিছুকেই ভালোবাসতে পারত না। এ কারণেই বলা যায়– চিরস্থায়ী জগৎ ও চিরন্তন জান্নাতের অস্তিত্বের অন্যতম প্রধান কারণ হলো– মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির মাঝে বিদ্যমান চিরস্থায়ী হওয়ার কামনা।
>
> তাহলে যে মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেনি এবং ন্যূনতম সচেতন, সে অবশ্যই দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী আনন্দ ও সুখ-শান্তির পরিবর্তে চিরস্থায়ী প্রশান্তি না পাওয়ার কারণে গভীর মনোবেদনায় ভুগবে। তার রুহ আর্তনাদ করবে ও কাঁদবে।’[৩]

সাঈদ নুরসি ছিলেন অত্যন্ত সংবেদনশীল প্রকৃতির মানুষ। তিনি জুলুম-অত্যাচার সহ্য করতে পারতেন না। ছোটোকাল থেকেই অন্যায়-অনাচার ঘৃণা করতেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তার এই

---

২. আশ শুআ-আত

৩. আল লাম’আত

চারিত্রিক গুণাবলি আরও বলিষ্ঠ ও সুদৃঢ় হয়েছিল এবং দায়িত্বশীল ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মুখোমুখি হওয়ার সময় এই চারিত্রিক গুণাবলি তাঁর আচার-আচরণে প্রতিফলিত হতো।

স্বপ্নে নবিজি

সাঈদ নুরসির জীবনে সবচেয়ে আনন্দময় ঘটনা ওই বছরের শীতে ঘটে, যখন তিনি ঘন বরফাচ্ছন্ন নুরস গ্রামে অবস্থান করছিলেন। সাঈদ নুরসি একরাতে স্বপ্ন দেখলেন, কিয়ামত সংঘটিত হয়েছে। কর্মফলের ফয়সালা হচ্ছে। সাঈদ নুরসি ভাবলেন– যেহেতু কর্মফলের ফায়সালা হচ্ছে, তাহলে এখানে তো প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মাদ ﷺ অবশ্যই থাকবেন।

নুরসি পুলসিরাতের নিকট অবস্থান করলেন। কারণ, তিনি ভাবলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ তো অবশ্যই এখান দিয়ে যাবেন। নুরসি চিন্তা করলেন, রাসূল ﷺ-এর দেখা পেলে তিনি তাঁর হাত মোবারক চুম্বন করে সম্মান প্রদর্শন করবেন। অবশেষে অপেক্ষমাণ নুরসি রাসূল ﷺ-এর দেখা পেলেন এবং তাঁর হাত মোবারক চুম্বন করে ইলমের জন্য দুআ চাইলেন। রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন– 'তোমাকে কুরআনের ইলম দেওয়া হবে এই শর্তে, তুমি আমার উত্তরসূরি আলিমদের পালটা কোনো প্রশ্ন করবে না।'

এই ঘটনা ও স্বপ্ন নুরসিকে বিমোহিত করে। প্রথমত রাসূল ﷺ-কে স্বপ্নে দেখা এবং কুরআনের জ্ঞান লাভের সুসংবাদ। অন্যদিকে বিতর্কের সময় আলিমদের পালটা প্রশ্ন করার ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর সতর্কবাণী। এ সতর্কের কারণে নুরসি কোনো সময় কোনো অবস্থাতেই কোনো আলিমকে পালটা প্রশ্ন করেননি।[৪]

প্রাথমিক শিক্ষা

অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন সাঈদ নুরসি। আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় **১৮৮২** খ্রিষ্টাব্দে 'তাগ' গ্রামে মুহাম্মাদ এফেন্দির মাদরাসায়। এরপর তিনি 'বিরমাস' গ্রামের একটি মাদরাসায় অধ্যয়ন চালিয়ে যান। উসমানি খিলাফাতের শেষ দিকে তুর্কিদের মাঝে পাশ্চাত্য পদ্ধতির রাষ্ট্র চেতনার অনুপ্রবেশ ধর্মীয় আলিমদের ন্যায়ানুগ জীবন ও জীবিকার পথে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেক্যুলার পদ্ধতির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারি অনুদান পেতে শুরু করলেও পূর্ব আনাতোলিয়ায় ধর্মীয় মাদরাসাগুলো চলত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ত্যাগ আর জনসাধারণের অনুদানের মাধ্যমে। তৎকালীন নিয়মানুসারে শিক্ষার্থীদের যাবতীয় ব্যয়ভার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর অর্পিত হতো। অন্যথায় দেশবাসীর জাকাত ও সাদাকা হতে তাদের ব্যায়ভার চালানো হতো। দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা তাদের ব্যায়ভার নিশ্চিত করতে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে জাকাত সংগ্রহ করত। কিন্তু শিশু সাঈদ জাকাত ও সাদাকার অর্থ গ্রহণে কখনো রাজি হননি। তিনি কখনো জাকাত ও সাদাকা সংগ্রহের জন্য যেতেন না, যা গ্রামবাসীকে বিস্মিত করে। জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত

৪. তারিচায়ে হায়াত

জাকাত ও সাদাকা গ্রহণ না করার নীতির ওপর অবিচল থেকেছেন। এই সম্পর্কে সাঈদ নুরসির তাঁর *রিসালায়ে নুরে* একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[৫]

শিক্ষাসনদ লাভ

১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তুরস্কের বিতলিসে অবস্থিত শাইখ আমিন এফেন্দির মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি বেশিদিন অবস্থান করেননি। সেখান থেকে তিনি মির হাসান আলির মাদরাসায় এবং 'ওয়াসতান কাওয়াস' নামক একটি মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি মোল্লা মুহাম্মাদ নামে তাঁর সহপাঠীর সঙ্গে বায়েজিদ এলাকায় অবস্থিত একটি মাদরাসায় চলে যান। উক্ত মাদরাসায় তিনি শাইখ মুহাম্মাদ জালালির তত্ত্বাবধানে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রতিদিন দুর্বোধ্য পুস্তকসমূহ থেকে দুইশো পৃষ্ঠা করে অধ্যয়ন করতেন এবং কোনো ধরনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও টীকা ছাড়াই তিনি সেগুলো স্বীয় মেধার গুণে বুঝতে পারতেন। এভাবে কিছুকাল অধ্যয়নের পর তিনি শাইখ মুহাম্মাদ জালালির নিকট থেকে শিক্ষাসনদ লাভ করেন।[৬]

অসাধারণ মেধা

শিক্ষাসনদ লাভের পর সাঈদ নুরসি তাঁর বড়ো ভাই মোল্লা আব্দুল্লাহর সঙ্গে দেখা করার জন্য সিরভান নামক স্থানে যান। তাদের প্রথম সাক্ষাতেই কথাবার্তা ছিল এ রকম–

> আব্দুল্লাহ : তুমি এখান থেকে যাওয়ার পর আমি শরহে শামসি শেষ করেছি। এই সময়ে তুমি কী পড়েছ?
>
> নুরসি : আমি প্রায় ৮০টি বই পড়েছি।
>
> আব্দুল্লাহ : কী বলছ!
>
> নুরসি : এগুলো ছাড়াও আরও অনেক বই পড়েছি।

অল্প সময়ে এত অধ্যয়নের ঘটনা আব্দুল্লাহর কাছে অসম্ভব মনে হলো, তাই তিনি বইগুলো থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলেন। অবশেষে ছোটো ভাই সাঈদ নুরসির ব্যাপারে তাঁর এই কৌতূহলী অনুসন্ধান বিস্ময়ে পরিণত হলো। নুরসি ঠিকঠাক উত্তর দিলেন। জ্ঞানার্জনের স্পৃহা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে নুরসি বললেন–

> 'অন্তরের রোগ বা প্রবৃত্তিকে বিনাশ করতেই তিনি নিয়মিত অধ্যয়ন চালিয়ে গিয়েছেন।'[৭]

কিন্তু আরও আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটল– যখন তারা সিরত নামক স্থানে শাইখ ফাতহুল্লাহ এফেন্দির মাদরাসায় গেলেন। শাইখ ফাতহুল্লাহ একজন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। তিনি সাঈদ নুরসিকে জিজ্ঞাসা করলেন– 'তুমি তো গত বছর সুয়ুতির আলফিয়া ইবনে মালিকের

---

৫. এই বইয়ের শেষে রিসালায়ে নুর অধ্যায়ে হাদিয়া গ্রহণ না করার কারণ শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে।

৬. তারিচায়ে হায়াত

৭. Sahiner Said Nursi 55-6

ব্যাখ্যাগ্রন্থ পড়েছ। এ বছর তুমি কি আলজামি (নাহুর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ) পড়বে?' নুরসি উত্তর দিলেন– আমি সেটা পুরোটাই পড়েছি।'

ফাতহুল্লাহ এফেন্দি তাঁর সামনে বিভিন্ন কিতাবের নাম ধরে ধরে প্রশ্ন করছিলেন আর নুরসি উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন। এটা দেখে শাইখ ফতহুল্লাহ হতবাক ও বিস্মিত হলেন। এরপর তিনি রসিকতা করে বললেন–'গত বছর তুমি পাগল ছিলে, এখনও কি তুমি পাগলই থেকে গেলে?' নুরসি বললেন– 'আমি এ সকল কিতাবের পরিক্ষা দিতেও প্রস্তুত।' বাস্তবে তাই হলো। তিনি কোনো প্রশ্নের সামনেই বিচলিত হননি। এটা সেই প্রখ্যাত আলিমকে হতবাক ও বিস্মিত করেছিল। পরিশেষে শাইখ ফতহুল্লাহ তাঁকে বললেন–

> 'খুব ভালো! নিঃসন্দেহে তোমার মেধা অসাধারণ। কিন্তু আমরা তোমার স্মৃতিশক্তি দেখতে চাই। তুমি কি মাকামাতে হারিরি কিতাবের কয়েক লাইন মাত্র দুইবার পড়ে মুখস্থ করতে পারবে?'

নুরসি বইটি নিয়ে তা থেকে এক পৃষ্ঠা মাত্র একবার পড়লেন। আর এটাই তাঁর মুখস্থ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। এটা দেখে ফাতহুল্লাহ এফেন্দি অবাক হলে বললেন–

> 'নিশ্চয়ই প্রখর স্মৃতিশক্তির সঙ্গে অসাধারণ মেধার সংমিশ্রণ একটি অত্যন্ত বিরল ও দুর্লভ বিষয়।'

সেখানে সাঈদ নুরসি *উসুলে ফিকহ* বিষয়ে ইবনে সুবকি প্রণীত *জামউল জাওয়ামি* গ্রন্থ এক সপ্তাহ অধ্যয়ন করলেন। তিনি প্রতিদিন দুই ঘণ্টা করে গ্রন্থটি এক সপ্তাহ অধ্যয়ন করলেন। এই সামান্য সময়ের অধ্যয়নই তাঁর এই পুস্তকটি মুখস্থ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। নুরসির এই অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তি দেখে ফাতহুল্লাহ এফেন্দি নুরসির *জামউল জাওয়ামি* গ্রন্থে লিখলেন–

> 'নিশ্চয়ই সে মাত্র এক সপ্তাহ সময়ে পূর্ণ *জামউল জাওয়ামি* গ্রন্থটি তাঁর হৃদয়পটে সংরক্ষিত করে ফেলে।'[৮]

খ্যাতির ঘ্রাণ

খুব অল্প সময়ে এই অসাধারণ তরুণের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। শহরের আলিমগণ জ্ঞানের গভীরতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট এসে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলার চেষ্টা করল। কিন্তু তিনি সবাইকে নীরব করে দিলেন। নুরসির জ্ঞান ও প্রজ্ঞার গভীরতা দেখে তুরস্কের আলিমরা তাঁকে মেশহুর সাঈদ নামে ডাকতে শুরু করলেন। ঠিক এই পর্যায়ে সাঈদ নুরসি বিতলিস শহরে গমন করেন। সেখান থেকে তিলো শহরে যান। ওই শহরের একটি ইবাদতখানায় কিছুদিন একাকী

৮. সিরাতে যাতিয়াহ : ৫২

অবস্থান করে ফিরোজাবাদী প্রণীত *আলকামুসুল মুহিত* নামক আরবি অভিধানের سين (সিন) অধ্যায় পর্যন্ত মুখস্থ করেন।[৯]

তিলো শহরে নুরসি

১৯৯১ সাল। সাঈদ নুরসির বয়স যখন সবে ১৮, তখন তিনি সিরতে বসবাস করছিলেন। অধ্যয়নের পাশাপাশি বক্তৃতা দেওয়া শুরু করলেন। শরিয়াহর ব্যাখ্যা, সমকালীন যুক্তিবাদের স্বরূপ এবং ইসলামের কালামশাস্ত্র সম্পর্কে তিনি বহু মূল্যবান বক্তব্য পেশ করছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তা ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধির ব্যাপারটা সাঈদকে ভাবনার জগতে নিয়ে গেল এবং তিনি সতর্ক হলেন। যে বিরাট জীবন বাকি আছে, তাঁর প্রস্তুতির প্রয়োজনে সাঈদ মনে করলেন, এই জনপ্রিয়তা তার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তিনি এ অবস্থায় সিরত ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সিরতের কেন্দ্র থেকে সরে এসে তিলো গ্রামে অবস্থান নেন। তিলোতে আসার পর থেকেই সাঈদকে পরিপার্শ্ব, সমাজব্যবস্থা ও রাজনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে প্রথমবারের মতো সচেতন হতে দেখা যায়।

একটি ছোটো ঘটনা এ সময় উল্লেখযোগ্য। সাঈদ যখন খেতে বসতেন, তাঁর স্যুপের মধ্যে রুটি চুবিয়ে আশেপাশের জড়ো হওয়া পোকামাকড়কে খেতে দিতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য ছিল–

> ‘আমি লক্ষ করলাম—তাদের একটা সামাজিক জীবন আছে। তাদের পরিশ্রম ও একত্রে কাজ করার স্পৃহা দেখে আমার শখ হলো—তাদের এই প্রজাতন্ত্রায়নকে পুরস্কৃত করি।’

সাঈদ নুরসি ১৯৩৫ সালে যখন ‘রাষ্ট্রদ্রোহী’ হিসেবে নির্যাতনের শিকার হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল– ‘প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে আপনার মতামত কী?’ নুরসি জবাব দিলেন–

> ‘আমার জীবনে ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে, এই এসকিশেহির আদালতের চেয়ারম্যান ব্যতীত আপনারা কেউ জন্মগ্রহণ করার আগ থেকেই আমি ধর্মীয়ভাবে একজন রিপাবলিকান ছিলাম।’ পূর্বে উল্লেখিত পিঁপড়ার সাথের গল্পটি পুনরায় বলার পরে তিনি বলে চললেন– ‘সুপথপ্রাপ্ত খলিফারা (খোলাফায়ে রাশেদা) প্রত্যেকেই প্রজাতন্ত্রের খলিফা এবং রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন (আশারায়ে মুবাশশারা) এবং নবি করিম ﷺ-এর সাহাবিদের মধ্যে আবু বকর সিদ্দিক (রা.) অবশ্যই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তবে এটা কোনো অর্থহীন পদ ও মর্যাদা ছিল না; তাঁরা বরং প্রতাজন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে শরিয়াহতের সত্য, ন্যায় ও স্বাধীনতাকে ধর্মীয় বিশ্বাস থেকেই ধারণ করতেন।’[১০]

মারদিন শহরে

১৮৯২ সালে সাঈদ নুরসি মারদিন শহরে শিক্ষকতা শুরু করলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৫ বছর। সেখানে তিনি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতেন। মারদিনে আগমনের পর থেকেই

---

৯. Bediuzzaman Said Nursi- SukranVahide

১০. তারিচায়ে হায়াত-৩৯, Vahide-30

বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসি রাজনৈতিকভাবে সচেতন হতে শুরু করলেন; যদিও জীবনে কখনোই তিনি প্রচলিত ধারার রাজনীতিতে সরাসরি যুক্ত হননি। ইসলামের নৈতিক বিধান ও সততার ওপর ভিত্তি করে যে প্রশাসনিক ও আইনি আখ্যান গড়ে উঠেছে, নুরসি আজীবন তা ব্যাখ্যা করলেন। বলা যায়, একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব না হয়েও ইসলামি রাজনীতির বয়ান তৈরি করেছেন, ইসলামি রাজনীতির প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এমন ইসলামি প্রজাতন্ত্রের স্বপ্ন দেখতেন—যা স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, সংবিধান ও আইনের শাসনের পাটাতনের ওপর দাঁড়ানো।

তুরস্কে প্রগতি, সংবিধান ও স্বাধীনতার আন্দোলন এক বিপুল শ্রেণির জনতা আর উসমানীয় পারিষদবর্গের অসহযোগিতায় পিছিয়ে গিয়েছিল। বদিউজ্জামান খোলাখোলিভাবে একটি জননির্বাচিত সংসদ, একটি বৈষম্যহীন সংবিধান এবং সবকিছুর ওপরে কুরআনিক আইনের ভিত্তিতে গঠিত রূপরেখায় একটি রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখলেন। ১৮৬০ সাল থেকে নব্য উসমানীয়রা এই আন্দোলনের সূচনা করেন। তবে বদিউজ্জামান সংসদ বা সংবিধানকে পাশ্চাত্যের মতো জনগণের কামনা-বাসনার সেবাদাস করার ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। তাঁর নীতি ছিল–

> ‘কুরআনিক মূলনীতির ভিত্তিতে সংবিধান রচিত হবে। সুনির্দিষ্ট কুরআনিক মূলনীতির মূলনীতি ব্যতীত বাকি যেকোনো ব্যাপারে সংসদ জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে ক্ষমতাপাপ্ত হবে। তবে হাদিসের সনদ, কিয়াস (অনুমান) ও ইজমার উসুল (ঐকমত্যের মূলনীতি) অনুসরণ করতে হবে।’

এই সময় প্রগতিশীল ও প্রযুক্তির ধারা বিকাশে আত্মোৎসর্গী মহান সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ তার প্যান-ইসলামিজম মতবাদ ছড়িয়ে দেন। এই মতবাদের তাত্ত্বিক গুরু মাওলানা জামালুদ্দিন আফগানি ইস্তাম্বুলে আসেন ১৮৯২ সালে। মুসলিম উম্মাহ এ সময় আল্লাহর প্রতি আকুণ্ঠ বিশ্বাস ও আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে প্যান-ইসলামিজমকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকলেও পাশ্চাত্য শক্তি, বিশেষ করে ফ্রান্স ও ব্রিটেন এর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বদিউজ্জামান নুরসি পূর্ব তুরস্কের কুর্দি অধ্যুষিত অংশগুলোতে এই প্যান-ইসলামিজমকে বিস্তৃত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তা ছাড়া প্যান-ইসলামিজম যখন উত্তর আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে, তখন ফরাসি, ব্রিটিশ ও ইতালীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণযুদ্ধের সূচনা হয়। মিশরের গ্রান্ড মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহ ছিলেন এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা। ইত্যবসরে শহরের শাসক নাদির বেক কিছু লোকের কুৎসা ও উসকানির আবর্তে পড়ে মনে করেন—এই লোকটি বিপজ্জনক এবং তিনি শহরে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারেন। তাই তিনি সাইদ নুরসিকে শহর থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিলেন। অতঃপর তাঁকে দুই হাত বেঁধে পুলিশের নজরদারিতে বিতলিস শহরে নিয়ে যাওয়া হলো।

বিতলিস শহরে

বিতলিসের গভর্নর উমর পাশার সাথে সাঈদ নুরসির আলাপ হলো। উমর পাশা জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় পেয়ে সাঈদ নুরসির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দুর্বল হয়ে পড়লেন। সাঈদ নুরসিকে নিজের বাড়িতে থাকার প্রস্তাব দিলেন উমর পাশা। তিনি সম্মতি দিলে বাড়ির নির্দিষ্ট একটা কক্ষ নুরসির

জন্য বরাদ্দ করলেন। সেখানে নুরসি বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়নের সুযোগ এবং বেশ কিছু গ্রন্থ আত্মস্থ করলেন। তিনি ধর্মতত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র, আরবি ব্যাকরণ, তাফসির, হাদিস ও ফিকহের বহু পুস্তক অধ্যয়ন করলেন। হৃদয়পটে সংরক্ষিত ওই গ্রন্থগুলো তিনি প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি করতেন এবং প্রতি তিন মাসে সেগুলো শেষ করতেন।[১১] এ ছাড়াও তিনি এই শহরে শীর্ষস্থানীয় আলিম মুহাম্মাদ কাফরাভির নিকট ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করলেন।

একদিন বদিউজ্জামান নুরসি বুঝলেন—গভর্নরের রুমে কিছু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ মদপানের আসর বসেছে। বদিউজ্জামান সোজা সেই ঘরে উপস্থিত হয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে মদ্যপানের জন্য উপস্থিত সকলকে সুন্দরভাবে নাসিহা করলেন এবং মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত ও হাদিস শুনিয়ে দিলেন। সকলেই কমবেশি বিব্রত বা বিরক্ত হলেন। গভর্নরের এক সহযোগী সরাসরি বাধা দিলেন। নুরসিকে হুমকি দেওয়া হলো—গভর্নরকে অপমানের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত গড়াতে পারে। সাঈদ নুরসি জানালেন–

> ‘আমার জন্য মৃত্যুর পরোয়ানা ঘটেনি। তবে আমি চিন্তা করছিলাম নির্বাসন বা কারাদণ্ড। যাহোক, যদি এর কারণে মৃত্যুও হয়ে থাকে, তবে তো আল্লাহর আইনের মর্যাদার জন্যই এই মৃত্যু, এতে ক্ষতির কিছুই নেই।’[১২]

এ ঘটনা উমর পাশাকে এতটাই প্রভাবিত করে যে তিনি নুরসির কাছে ক্ষমা চান এবং তওবা করেন। এরপর বিনীতভাবে বলেন–

> ‘প্রত্যেক ব্যক্তিরই কোনো না কোনো একজন আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক থাকেন। আমার আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক আপনি এবং আমি আপনার সাথেই থাকব।’[১৩]

---

১১. Bilinmeyen Taraflariyle Bediudzzaman Said Nursi : 57

১২. তারিচায়ে হায়াত ৪২-৩, Vahide-36

১৩. তারিচায়ে হায়াত ৪২-৩, Vahide-36